দুই রাজকুমারের বিদায়

ফ্যাক্ট ফাইল : জিনেদিন জিদান

জন্ম : ২৩ জুন, ১৯৭২
ক্লাব : ব্যানাস, বোর্দোক্স, জুভেন্টাস, রিয়াল মাদ্রিদ
পজিশন : অ্যাটাকিং মিডফিল্ড
আন্তর্জাতিক ম্যাচে ডেব্যু : বিপক্ষ চেক রিপাবলিক, ১৯৯৪
আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল : ৯৩ ম্যাচে ২৬ গোল
আন্তর্জাতিক ম্যাচে সমাপ্তি : বিপক্ষ গ্রিস, ২০০৪
আন্তর্জাতিক ম্যাচে সাফল্য : ১৯৯৮'- বিশ্বকাপ ও ২০০২'র ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জয়
ব্যক্তিগত সম্মান : ফিফা ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৩
ইউরোপিয়ান প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার ১৯৯৮

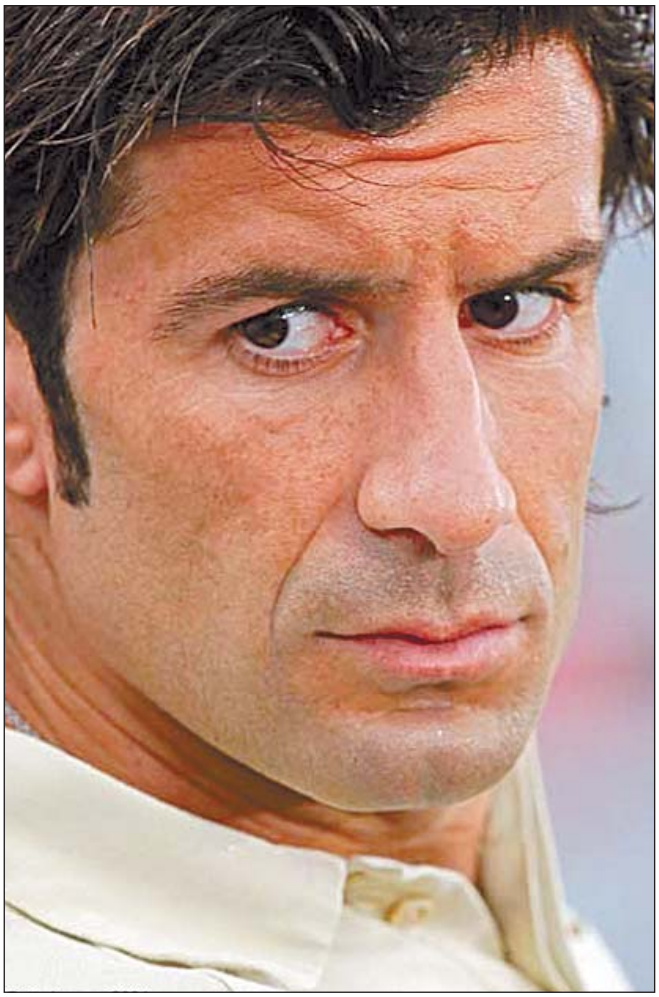

ফ্যাক্ট ফাইল : লুইস ফিগো

জন্ম : ৪ নবেম্বর, ১৯৭২
ক্লাব : স্পোর্টিং পর্তুগাল, বার্সিলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ
পজিশন : রাইট মিডফিল্ড, লেফট্ মিডফিল্ড
আন্তর্জাতিক ম্যাচে ডেব্যু : বিপক্ষ লুক্সেমবার্গ, ১৯৯১
আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল : ১১০ ম্যাচে ৩১ গোল
আন্তর্জাতিক ম্যাচে সমাপ্তি : বিপক্ষ গ্রিস, ২০০৪
আন্তর্জাতিক ম্যাচে সাফল্য : ২০০৪-এর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ।
ব্যক্তিগত সম্মান : ফিফা ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার ২০০১
ইউরোপিয়ান ফুটবলার অব দ্য ইয়ার ২০০০

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

সপ্তাহের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ফুটবল হারালো দু'জন শিল্পী- জিনেদিন জিদান ও লুইস ফিগো। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নিশ্চিতভাবেই আরো কিছুদিন মাঠ কাঁপাবেন তারা। কিন্তু ফ্রান্স ও পর্তুগালের জার্সি গায়ে তাদের আর কখনোই দেখা যাবে না।

ফ্রান্স ও পর্তুগাল তো বটেই, সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য তাদের এ সিদ্ধান্ত শুধু দুঃখই বয়ে এনেছে। কেননা জিদান ও ফিগো তো শুধু ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন না, ছিলেন 'ফুটবল শিল্পী'। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, তারা এখনো তাই আছেন। কিন্তু জিদান, ফিগোর বিশ্বাস আলাদা। বিদায় ঘোষণায় জিদান বলেছেন, 'অবসরের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনেক ভেবেছি। আমি মনে করি, নিয়তি নির্ধারিত সময়ে সবাইকে 'স্টপ' বলতে হয়। এখন আমার সেই সময়। এটা একটা চক্রের পরিসমাপ্তি।' ফিগোর কণ্ঠেও আলাদা সুর নয়। বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আমি থামার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। ভবিষ্যতে কি হবে সেটা আমরা কেউ জানি না। দেশের ডাক আমি কখনো উপেক্ষা করবো না। প্রয়োজন হলে জাতীয় দলে আবার ফিরতে পারি।' ফিগো বলেছেন 'থামা'র কথা, 'ফেরা'র কথাও। ভক্তরা জানেন

থামাটাই অর্থবহ, ফেরাটা নয়।

এ দু'জনকে কেন এতো মিস্ করবে বিশ্ব ফুটবল? কি তাদের বিশেষত্ব? বিশেষত্ব আছে। তারা দু'জনই পেলে, ম্যারাডোনা, ক্রুয়েফ ঘরানার ফুটবলার। নিয়ত সৃষ্টিশীল। বল নিয়ে এমন সব কারুকাজ করেন, যেটা দেখে বিশ্বের অধিকাংশ ফুটবলারই তাদের ভক্ত বনে যান। আর দর্শকদের কথা না হয় নাই বললাম। দীর্ঘদিনের ফুটবল সঙ্গী বিজেন্তে লিজারাজু যথার্থই বর্ণনা করেছেন জিদানের ক্ষমতাকে, 'বল নিয়ে কি করব, এটা যখন বুঝতে পারি না, তখন জিজুকে খুঁজি। তাকে বলটা পাস দিয়ে দিই। জানি, সে কিছু একটা করবেই।'

আর ফিগোকে তার দেশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বর্ণনা করা হয়েছে, 'পর্তুগিজ ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা প্রতীক' হিসেবে। ব্ল্যাক প্যান্থার ইউসোবিওর দেশ যদি পর্তুগাল না হতো, তাহলে 'অন্যতম' শব্দটা সহজেই বাদ দেয়া যেতো।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে জিদানের গল্প রূপকথার মিলনাত্মক গল্পের মতো। যদিও শেষটা তার ভালো হয়নি। তবুও আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়ে তার সন্তুষ্ট হবারই কথা। ১৯৯৪ সালে চেক রিপাবলিকের বিপক্ষে ডেব্যু হয় তারা। বদলি খেলোয়াড় হিসেবে তিনি যখন মাঠে নামেন তখন দু'গোলের ব্যবধানে পিছিয়ে ফ্রান্স। মাত্র ১৭ মিনিটের মধ্যে জিদান ম্যাজিকে ম্যাচে ফেরে সমতা। দু'টি গোলই করেন তিনি। স্বপ্নেও এতো ভালো ডেব্যু নিশ্চয়ই কল্পনা করেননি জিদান।

সে-ই যে শুরু, এরপর শুধু এগিয়ে যাওয়া। সাফল্য বুভুক্ষু ফ্রান্সকে তিনি একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছেন। '৯৬-র ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারেননি। তবে জিতেছেন পরের দু'টি বড় আসরের শিরোপা- '৯৮-র বিশ্বকাপ ও ২০০০-র ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। দু' টুর্নামেন্টেই ফ্রান্সের শিরোপা জয়ে মূল অবদান জিদানের। '৯৮র বিশ্বকাপ তো জিদানের জন্য অবিস্মরণীয় এক টুর্নামেন্ট। স্বদেশের মাটিতে ফ্রান্স ছিলো ফেবারিটদের তালিকায়ই। কিন্তু কোনোভাবেই ব্রাজিলের আশপাশে নয়। ফাইনালে ফ্রান্স-ব্রাজিল মুখোমুখি হলে পেলের দেশই ছিলো হট ফেবারিট। কিন্তু ফাইনালে একজন জিদানের কাছেই হেরে যায় তারা। হেড দিয়ে দু'দুটো গোল করেন জিদান। অথচ তার ফুটবল দক্ষতার দুর্বলতম ক্ষেত্র হেডিং। জিদানের কল্যাণে ৩-০ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতে ফ্রান্স। দু'বছর পর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে ফ্রান্স। যার সিংহভাগ কৃতিত্ব যথারীতি জিদানের।

তবে জিদানের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে হতাশাও আছে। শেষটা তিনি ভালো করতে পারেননি। ২০০২'র বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন না পুরোপুরি ফিট। জিদান ছাড়া যে তারকাখচিত হট ফেবারিট ফ্রান্স কতোটা তারকাশূন্য সেটা বোঝা গিয়েছিলো তখন। প্রথম পর্বের শেষ ম্যাচে তিনি মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ চেষ্টা করেও জিদান পারেননি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে ফ্রান্সের বিদায় ঠেকাতে। যেমন পারেননি ২০০৪-এর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠতে। ডার্ক হর্স গ্রিসের কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নেয় ফ্রান্স। ঐ ম্যাচটি হয়ে আছে জিদানের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

মিডফিল্ডার হিসেবে খেললেও দলের বিপদের সময়ে তাকে গোলদাতার ভূমিকায় প্রায়ই অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক ফুটবলে জিদানের গোলসংখ্যা ২৬। যার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে করা ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণী গোল। শুধু ৩টি ম্যাচের কথা ভাবুন। চেকদের বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ, '৯৮-র বিশ্বকাপ ফাইনাল ও ২০০০-এর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ। এতেই তার গোল স্কোরিং ক্ষমতা বোঝা যায়। বোঝা যায় তিনি বিপক্ষের জন্য কতোটা ভয়ঙ্কর।

লুইস ফিগোর রূপকথার গল্পের শুরুটা স্বপ্নের মতো। এরপর শুধুই হতাশা, বঞ্চনা, অপ্রাপ্তির দুঃস্বপ্ন। ১৯৯১ সালে পর্তুগালের যে দলটি ফিফা ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে, ফিগো ছিলেন সে দলের মূল চালিকাশক্তি। পর্তুগালের 'গোল্ডেন জেনারেশন' -এর উদ্ভব তখনই। পর্তুগিজরা তখন থেকেই আশায় বুক বেঁধেছিলো এ দলটি নিশ্চয়ই তাদের একদিন বড় শিরোপা এনে দেবে। বছরের পর বছর, টুর্নামেন্টের পর টুর্নামেন্ট ফিগোরা শুধু স্বপ্নই দেখিয়েছে। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারেননি। '৯৪, '৯৮-র বিশ্বকাপে পর্তুগাল কোয়ালিফাই করতে পারেনি। ২০০০-এর ইউরোতে উঠেছিলো সেমিতে। ২০০২-র বিশ্বকাপে প্রথম রাউন্ডে বিদায়। সর্বশেষ সুযোগ এসেছিলো ২০০৪-র ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। স্বদেশে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টের ফাইনালেও উঠেছিলো পর্তুগাল। কিন্তু গ্রিসের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে শূন্য হাতেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাতে হয় ফিগোর।

লুইস ফিগোর বিশেষত্ব ড্রিবলিং, পেস ও ক্রস। দু'উইংয়ে তার দ্রুতগতির ছুটে চলা ডিফেন্ডারদের বরাবরই অস্বস্তিতে ফেলতো। তার নিখুঁত ক্রস অধিকাংশ সময়ই স্ট্রাইকারের পা বা মাথা খুঁজে নিতো। ফিগোর খেলা দেখা যে কোনো দর্শকের জন্যই বিনোদন।

রক্ষণাত্মক ফুটবলের এ যুগে সবাই খেলে রেজাল্টের জন্য। এরই মাঝে জিদান, ফিগো মেতে উঠতেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। বিনোদিত করতেন দর্শকদের। প্রবীণ দর্শকরা জিদান, ফিগোর খেলা দেখে হতো স্মৃতিকাতর। ফিরে যেতো '৬০ ও '৭০র দশকের ফুটবলে। ২০০৬'র বিশ্বকাপে দর্শকরা নিশ্চিতভাবে মিস্ করবে ফুটবলের দুই যাদুকর জিনেদিন জিদান ও লুইস ফিগোকে।